মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)

2005 সালে প্রণীত জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে প্রত্যেক আর্থিক বছরে প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে যার বয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম করতে ইচ্ছুক তাঁদের অন্তত একশত দিনের মজুরির কর্মনিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেশের গ্রামীণ এলাকার পরিবারগুলির জীবিকা অর্জনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষযগুলির জন্য এ আইন তৈরী করা হয়েছে। এই আইনকে কার্যকরী করার জন্য আইনের বিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের কর্তব্য হল একটি করে কর্মনিরাপত্তা প্রকল্প (Scheme) রচনা করা।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের (2005) উদ্দেশ্য আইনের প্রস্তাবনা, তিন নম্বর ধারা এবং এক নম্বর তফসিলে (আইটেম নং 2) উল্লেখ করা হয়েছে। এই কর্মনিশ্চয়তা আইনের (NREGA) মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামের প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারকে নিজের মর্যাদা বজায় রেখে জীবনধারণের উপযোগী অর্থ উপার্জন সুনিশ্চিত করা। এই আইন প্রত্যেক কর্মপ্রার্থীকে যিনি অদক্ষ কিন্তু কায়িক শ্রম দিতে ইচ্ছুক তাঁকে অন্তত এক শত দিনের কাজের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে [3(1) ধারা] এবং আরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তিনি প্রতি সপ্তাহের শেষে ন্যূনতম মজুরি হিসাবে সব টাকা পাবেন। এই কাজের জন্য দাবি জানানো এবং তা পাওয়া তাঁর অধিকার। কাজের দাবি জানিয়ে কাজ না পেলে ঐ ব্যক্তি বেকার ভাতা পাবেন [7(1) ধারা]।

তাছাড়া, গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা এবং এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের ভিত্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা (strengthening the livelihood resource base) এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য (Schedule No. 1, Item No. 2)।

এই আইনকে একটি মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের কর্মসূচী হিসাবেই দেখা হয়। কিন্তু এর আগে যেসব এ ধরনের কর্মসূচী বা প্রকল্প ছিল এই কর্মনিশ্চয়তা আইন সেগুলি

Scanned with CamScanner

থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রিলিফ্ ওয়ার্ক (Relief Work) চালু ছিল। 1977 সাল থেকে চালু হল কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work) প্রকল্প। আবার আটের দশকে এল এই প্রকল্পটির পরিবর্তে জাতীয় গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প (National Rural Employment Programme) এবং গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (NLEGP)। এই প্রকল্প দুটি একত্রিত করে তৈরী হল জওহর রোজগার যোজনা (SRY) যার নাম দুবার পরিবর্তন করা হয়েছে—প্রথমে জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (সভা) এবং পরে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY)। উল্লেখ্য, 2004 সালে জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (National Food for Work) প্রকল্প চালু হয়। এই সব প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য মোটামুটি একই; কিছু খাদ্য ও অর্থের বিনিময়ে কাজ দেওয়া। কোনো কোনো প্রকল্প আবার কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য। আবার এই কাজগুলির প্রকৃতিও প্রায় এক। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কাজে সুযোগ বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়ন চলছিল। এগুলি হল সরকারের বিভাগীয় প্রকল্প। আর কর্মনিশ্চয়তা আইন সংসদ কর্তৃক প্রণীত। এ আইন গ্রামবাসী কাজ চাইলে কাজ পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (SGRY) এবং জাতীয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (NFFWP) জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়েছে। এই আইন কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্র সরকার বিধি ও নিয়মাকানুন (Rules and Regulations) রচনা করেছে। অনুরূপ-ভাবে রাজ্য সরকারগুলিও প্রকল্প ও নিয়মবিধি তৈরী করেছে।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন 2005 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাস হয় এবং পরের বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই আইনটি কার্যকরী হয় প্রথম পর্যায়ে খুবই অনুন্নত এমন 2005টি জেলাতে। পরের আর্থিক বছরে এটি আরও 330টি জেলাতে সম্প্রসারিত হয়। 2008 সালে 1 এপ্রিল থেকে অবশিষ্ট এলাকায় আইনটি বলবৎ হয়েছে এবং 2009-2010 আর্থিক বর্ষ থেকে এটি 'মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প' নামে পরিচিতি লাভ করে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য (Features of MGNREGS)

জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

প্রথম, এ আইনে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের কর্মসূচি রয়েছে। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক শ্রম দিতে চাইলে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিত বা মৌখিকভাবে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারেন। অনুসন্ধান করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেক আবেদনকারীকে জব কার্ড (Job Card) দেবেন। এই

Scanned with CamScanner

কার্ড পাওয়ার পর প্রত্যেককে কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করতে হবে বা নিরক্ষর হলে মৌখিকভাবে বলতে হবে।

দ্বিতীয়, আবেদনকারী 15 দিনের মধ্যে কাজ না পেলে বেকার ভাতা পাবেন। তাছাড়া, কাজ গ্রামের 5 কিলোমিটারের বাইরে হলে তিনি অতিরিক্ত মজুরি পাবেন। সরকার নির্ধারিত মজুরি তাঁকে দেওয়া হবে।

তৃতীয়, যাঁদের কাজ দেওয়া হচ্ছে তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা থাকবেন। তাছাড়া, কর্মস্থলে কিছু সুবিধা যেমন বাচ্চাদের রাখবার ব্যবস্থা, পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থ, কর্মস্থলে কোনো শ্রমিক আহত হলে রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং ব্যয়ভার বহন করবেন।

পঞ্চম, এই প্রকল্পে শ্রমভিত্তিক কাজ হয়ে থাকে। কোনো কনট্রাক্টরের মাধ্যম বা শ্রমিকের বদলে যন্ত্র পরিচালিত কোনো কাজ হয় না।

ষষ্ঠ, প্রকল্প রচনা ও কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতকেই দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির খসড়া গ্রাম সভা এবং ওয়ার্ড সভা প্রস্তুত করে পাঠালে তার উপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হল এলাকায় প্রজেক্ট নির্ধারণ করা। প্রোগ্রাম অফিসার অনুমোদন করলে গ্রাম পঞ্চায়েত স্কীমের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো প্রজেক্ট রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পের অর্ধেক কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয় কার্যকরী করার জন্য।

সপ্তম, সমস্ত কাজের হিসাব এবং নথিপত্র সকলের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে যাতে প্রত্যেক প্রয়োজন মতো তথ্য পেতে পারেন। নির্দিষ্ট ফি (fee) দিয়ে এগুলি পাওয়া যায়।

অষ্টম, কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুসারে কোন কোন বিষয়ে প্রকল্প তৈরী করা যাবে অর্থাৎ কি ধরনের কাজ করা যাবে তারও একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল ঃ

(1) জল সংরক্ষণ ও জল সঞ্চয়,

(2) খরা প্রতিরোধ (বনসৃজন ও বৃক্ষরোপণ সহ),

(3) সেচের খাল (ক্ষুদ্র ও ছোটোখাটো সেচের কাজ সহ),

(4) তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি, ভূমি সংস্কারের উপভোক্তা, বি. পি. এল. তালিকাভুক্ত পরিবার, ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা,

Scanned with CamScanner

(5) চিরাচরিত পানীয় জলের উৎস সংস্কার,

(6) ভূমি উন্নয়ন,

(7) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কাজ (জলমগ্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সহ)

(8) সব ঋতুর উপযোগী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং

(9) রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্যান্য কাজ।

বাস্তবায়ন ও পরিধারণ আধিকারিকবৃন্দ (Implementing and Monitoring Authorities)

জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন বাস্তবায়ন ও পরিধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মনিশ্চয়তা কাউন্সিলের (Central Employment Guarantee Council) উপর। এই কাউন্সিলের সদস্যদের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ করেন। নিম্নে উল্লিখিত সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠিত ঃ

(a) চেয়ারপার্সন।

(b) যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয় এমন কয়েকজন পরিকল্পনা কমিশন সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সদস্য।

(c) কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত কয়েকজন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি।

(d) পঞ্চায়েতীরাজ, শ্রমিকদের সংগঠন প্রভৃতি থেকে অনধিক 15 জন বেসরকারি সদস্য। অবশ্য এইসব সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা থাকবেন।

(e) কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত রাজ্যের কয়েকজন প্রতিনিধি।

(f) কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন সদস্য সচিব।

এই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কাজ হল ঃ

(1) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন ও পরিধারণ (monitoring) ব্যবস্থা গঠন করা।

(2) এই আইন কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান করা।

(3) পরিধারণ ও ক্ষোভ দূরীকরণ ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

(4) প্রকল্পটির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

(5) আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা যা সংসদে পেশ করা হবে, প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

ঠিক একই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে রাজ্য কর্মনিশ্চয়তা কাউন্সিল (State Employment Guarantee Council) গঠিত হয়েছে। এই কাউন্সিলের সদস্যদের রাজ্য সরকার নিয়োগ করেন। রাজ্য কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(a) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ও তার রূপায়ণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া,

(b) উপযুক্ত কাজ নির্ধারণ করা,

(c) তদারকি ও অভিযোগ প্রতিবিধান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা এবং এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশ করা,

(d) জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিরাপত্তা আইন ও প্রকল্প সম্পর্কে সমস্ত তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা,

(e) রাজ্যে এই আইন ও পকল্প রূপায়ণে তদারকি করা এবং এরূপ রূপায়ণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সমন্বয় সাধন করা,

(f) এই প্রকল্পের বিষয়ে রাজ্য সরকার রাজ্য আইনসভায় যে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করেন তা প্রস্তুত করা, এবং

(g) কেন্দ্রীয় পর্ষদ বা রাজ্য সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

পঞ্চায়েতের দায়িত্ব

কর্মনিশ্চয়তা আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের মূল দায়িত্ব থাকবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের হাতে। জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (District Programme Coordination) জেলা স্তরের পঞ্চায়েতকে এই আইন অনুসারে দায়িত্ব পালনে এবং প্রকল্প রূপায়ণে সাহায্য করবেন। জেলায় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য তিনিই দায়ী থাকবেন। ব্লকভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়া এবং ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গৃহীত প্রকল্পগুলি তদারকি করা জেলা পরিষদের কাজ। জেলা পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বা জেলাশাসককে রাজ্য সরকার এই পদে নিয়োগ করেন। প্রোগ্রাম অফিসার (Programme Officer) ও জেলায় কর্মরত অন্যান্য রাজ্য সরকারি আধিকারিক এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য হচ্ছে জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরকে সাহায্য করা। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের নীচে নয় এমন পদমর্যাদার আধিকারিককে রাজ্য সরকার মধ্যবর্তী পঞ্চায়েত স্তরে প্রোগ্রাম আধিকারিক (Programme Officer) হিসাবে নিয়োগ করবেন। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ব্লক পরিকল্পনা রচনা করা ও তার অনুমোদন

Scanned with CamScanner

দেওয়া এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে গৃহীত প্রকল্পগুলি তদারকি করাই মূলত ব্লকস্তরের পঞ্চায়েতের কাজ।

প্রোগ্রাম আধিকারিক জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থেকে কাজ করেন। তাঁর মূল দায়িত্ব হল ঃ

(1) গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য রূপায়ণকারী সংস্থা যেসব প্রজেক্ট কার্যকরী করছে তা তত্ত্বাবধান করা,

(2) সকল শ্রমিক যাতে সঠিক মজুরি পায় তা সুনিশ্চিত করা,

(3) প্রত্যেক গ্রাম সভা যাতে নিয়মিত সামাজিক নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে তা সুনিশ্চিত করা,

(4) প্রকল্প সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি।

কর্মনিরাপত্তা কর্মসূচী রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপর্ণ। এই স্তরেই প্রকল্প সনাক্তকরণ ও প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, জব কার্ড বন্টন, কাজের সুযোগ প্রদান, মজুরি বিতরণ সবই হয়ে থাকে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে হিসাবপত্র ও অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হয় এবং গ্রামসভা ও ওয়ার্ড সবার সময় সেগুলি পেশ করতে হয়।

অর্থের যোগান

এই আইনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কর্মনিশ্চয়তা তহবিল আছে; জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা তহবিল এবং রাজ্য কর্মনিশ্চয়তা তহবিল।

প্রকল্প ও প্রকল্প বাবদ ব্যয় কিভাবে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টিত হবে তা আইনে 22 নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের সম্পূর্ণ মজুরি, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি এবং উপকরণের জন্য খরচের 75 ভাগ এবং নির্ধারিত প্রশাসনিক ব্যয় কেন্দ্র সরকার বহন করবে। এই প্রশাসনিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রোগ্রাম অফিসার ও তার কর্মচারীবৃন্দের বেতন এবং কর্মস্থলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান বাবদ খরচা ইত্যাদি।

অপরদিকে রাজ্য সরকারকে দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি ও উপকরণ বাবদ খরচের 25 শতাংশ, বেকার ভাতা এবং রাজ্য কর্মনিশ্চয়তা কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যয় বহন করতে হবে।

Scanned with CamScanner

নিরীক্ষা (Audit)

প্রকল্পের অধীনে সমস্ত কাজের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য আইনে দুটি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে : বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (Statutory Audit) এবং সামাজিক সমীক্ষা (Social Audit)।

বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্র সরকার স্থির করে দেন। তবে সর্বশেষ স্তরে নিরীক্ষা করে স্থানীয় হিসাব পরীক্ষক (Examiner of Local Accounts)। এরা সি. এ. জি-র অধীনে থেকেই কাজ করে।

তাছাড়া, নিয়মিত সামাজিক নিরীক্ষণের ব্যবস্থাও এই আইনে করা হয়েছে। এই নিরীক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রাম সভাকে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হল বিল, ভাউচার, অনুমোদনের আদেশের কপি প্রভৃতি সহ সংশ্লিষ্ট-নথিপত্র গ্রাম সভাকে সরবরাহ করা (17 নং ধারা)।

অসন্তোষ নিরসনের ব্যবস্থা (Grievance Redressal Mechanism)

কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প এবং ঐ প্রকল্প রূপায়ণ সংক্রান্ত কোনো অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্লক পর্যায়ে প্রোগ্রাম অফিসার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের কাছে আবেদন করতে পারেন। অসন্তোষ নিরসনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি রচনার দায়িত্ব আইনে রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে (19 নং বিধি)।

তাছাড়া, কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান ভঙ্গ করলে ঐ ব্যক্তি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন (25 নং উপধারা)।

মূল্যায়ন

স্বাধীনতার পর থেকে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো তৈরী করার জন্য অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু 2005 সালে সংসদ প্রণীত জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন সর্বশ্রেষ্ঠ। এটি একটি সুচিন্তিত বাস্তবধর্মী আইন। এ আইন গ্রামবাসীকে কাজের অধিকার দিয়েছে। কাজ পাওয়া এবং না পেলে বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকার দরিদ্র গ্রামবাসীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। কাজ পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের প্রধান বা সরকারি আমলা বা কোনো রাজনৈতিক দলের নেতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। কেউ কাজ করতে চাইলে তাঁকে কাজ বা বেকার ভাতা দেওয়া ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের আইনানুগ দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, এ আইন কেবলমাত্র মজুরিভিত্তিক কর্মসূচী নয়, এলাকায় সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হবে তারও একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে যাতে করে ঐ বিষয়গুলির উপর কাজের ফলে গ্রামে সম্পদ

Scanned with CamScanner

সৃষ্টি হবে। এই সম্পদ থেকেই এলাকার উন্নতি হবে এবং আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাস্তবিক কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই সম্পদ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন, জল সংরক্ষণ, জল সংরক্ষণের আধার তৈরী, কূপ খনন, ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা, বন্যা বা খরা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, উদ্যান পালন, ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কর্মনিশ্চয়তা ও সম্পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত কাজকর্মের উপর একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে এই প্রকল্প যুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত কাজকর্মের একটা হিসাব গ্রাম সভার কাছে পেশ করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া, কাজের হিসাব ও নথিপত্র দেখবার ও তার অনুলিপি পাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। এছাড়া, তথ্য জানার অধিকার আইন সব রাজ্যেই প্রচলিত হয়েছে।

সাধারণ গ্রামবাসী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাগরিক সংগঠন (civil society) সচেতন হলে এই আইন অনুসারে কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়বে।

সংবাদপত্র ও কিছু গবেষকদের প্রতিবেদন থেকে এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানান ত্রুটি বিচ্যুতির তথ্য উঠে এসেছে। অনেকে মনে করেন যে এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে গেছে। টাকা-পয়সা তছরুপ হয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থে কোনো কোনো ব্যক্তিকে প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পটি মাত্র দুবছর চালু হয়েছে। এই পরিচালনা পদ্ধতি বেশ জটিল। এর সঙ্গে যুক্ত যেসব আধিকারিক ও অন্যান্য ব্যক্তি যাঁরা রয়েছেন তাঁদের এ প্রকল্প রূপায়ণ পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন প্রশিক্ষণ নেই। কাজকর্ম পরিদর্শন ও দেখভাল করার মতো পরিকাঠামো সব রাজ্যে গড়ে ওঠেনি। তাই আশা করা যায় আস্তে আস্তে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। তথ্যের অধিকারকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নিরীক্ষা করেছেন তাতে অনেক অনিয়ম ধরা পড়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

এই আইন প্রয়োগে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়লেও সাফল্যের দিকটাও অনেকের নজরে এসেছে। কোনো কোনো রাজ্যে গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে কাজ করেছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে, কিছু সম্পদ গড়ে উঠেছে। রাজস্থানে গড়ে 77 দিনের কাজ পেয়েছেন আবেদনকারীরা। আবার তামিলনাড়ুতে 81 শতাংশ মহিলা কাজে যোগদান করেছেন।

এই প্রকল্পটি সম্পর্কে বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা থাকা দরকার বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে। তাহলে সরকারি আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে চেতনা বাড়াবে।

Scanned with CamScanner

পরিচালনার ক্ষেত্রে যথার্থ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। তা না হলে রাজ্য সরকারের পক্ষে ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, আগের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী থেকে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সম্পূর্ণ আলাদা লক্ষ্য, গুণাগুণ ও ব্যাপ্তির দিক থেকে। তাই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এই প্রকল্প বর্তমানে সারা দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই প্রকল্পটি রূপায়ণের বিষয় খুব হালকা ভাবে নেওয়া যায় না। সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে এখনই সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই অনেকে মনে করেন যে কিছু কিছু প্রখ্যাত বেসরকারি সংস্থা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সেবামূলক সংস্থাকে কিছু কিছু দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

সর্বোপরি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম সভাকে সক্রিয় করে তুলতে পারলেই কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হবে। আধিকারিকদের কাজের মধ্যে দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এসে যাবে।

Scanned with CamScanner

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা (National Food Security)

আমাদের সংবিধানে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর অর্থ মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করার অধিকার (21 ধারা)। একইভাবে সংবিধানে 31(a) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এমনভাবে কীর্তি নির্ধারণ করবে যাতে প্রত্যেক নাগরিক পর্যাপ্ত উপজীবিকার অধিকার (adequate means of livelihood) ভোগ করতে পারে। আবার 47 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 2005-06 সালে প্রকাশিত জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সার্ভে প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের শতকরা 45 ভাগ অপুষ্টতা এবং তিন বছরের নীচে বয়স্ক শিশু এবং 50 বছরের নীচে বয়স্ক মহিলারা রক্তাল্পতায় ভুগছে।

Scanned with CamScanner

এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার 2013 সালে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (National Food Security Act) পাশ করান। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র দেশের সকল ব্যক্তির জন্য সরকারী উদ্যোগে খাদ্য সরবরাহ এবং এ সম্পর্কীত ব্যবস্থ গ্রহণ করা যাতে মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণের অধিকার সুরক্ষায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য সুনিশ্চিত করা যায়।

খাদ্য সুরক্ষার অধিকার (Right to Food Security)

খাদ্য সুরক্ষা আইনের (4 থেকে 10 অনুচ্ছেদ) প্রত্যেক নাগরিককে খাদ্য সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত খাদ্য সকলের জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, খাদ্য সুরক্ষা সম্পর্কে 'জীবন চক্র' (Life-cycle) নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্ব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সঠিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সরকারের দায়িত্ব।

তাছাড়া, ছয় বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশু এবং মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অপুষ্টিজনিত রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়া, গৃহহীন ব্যক্তি, উদ্বাস্তু, বিপর্যয়ে পড়া মানুষদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। কোন ব্যক্তি বা পরিবার অনাহারক্লীষ্ট হলে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবার জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার (Right to Receive Subsidized Food Grains)

খাদ্যশস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দু'টি তালিকা করা হয়েছে—বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত এবং সাধারণ পরিবার। এইভাবে রেশন কার্ডও প্রস্তুত করা হয় এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

গণবন্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System)

গণবন্টন ব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ দায়িত্বে পরিচালিত। খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রত্যেক রাজ্যে এই সংগ্রহের জন্য বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে শস্য-ভান্ডারের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা উভয় সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shop) খোলার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

Scanned with CamScanner

তাছাড়া, অনুদানপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের বিক্রয়, বন্টন, সংগ্রহ ও তদারকি করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

জাতীয় খাদ্য কমিশন (National Food Commission)

আইনে দু'টো প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে—কেন্দ্র স্তরে জাতীয় খাদ্য কমিশন এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য খাদ্য কমিশন।

জাতীয় খাদ্য কমিশন হল একটি যৌথ সংস্থা যার স্থায়ী পারম্পর্য এবং একটি সাধারণ সীলমোহর আছে। এটি এমন একটি সংস্থা যে মামলা করতে পারে এবং যার বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।

এই কমিশনে আছেন একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য সচিব এবং পাঁচজন সাধারণ সদস্য। একটি নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এঁদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই নির্বাচন কমিশনে আছেন—

1. প্রধানমন্ত্রী (চেয়ার হিসাবে),
2. নোডাল এজেন্সীর মন্ত্রী,
3. লোকসভার বিরোধী দলের সদস্য, এবং
4. (ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, (খ) জাতীয় মহিলা কমিশন, (গ) জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, (ঘ) সিভিল রাইটস্ সংরক্ষণ কমিশন, (ঙ) তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য জাতীয় কমিশন, (চ) তপশিলি উপজাতিদের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যানগণ।

জাতীয় খাদ্য কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং অন্য সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন নিম্নলিখিত সদস্যদের মধ্য থেকে—

(i) যিনি কেন্দ্রীয় কৃত্যকে কাজ করেছেন এবং খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, জনপরিষেবা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ,

(ii) আইন, মানবিক অধিকার, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজসেবা, খাদ্য নীতি বা জনপ্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞ সনামধন্য ব্যক্তি;

(iii) খাদ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন সম্পর্কে কাজকর্মে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি।

রাজ্য খাদ্য কমিশন

অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে একটি খাদ্য কমিশন (State Food Commission) আছে। একজন চেয়ারম্যান, সদস্য সচিব এবং পাঁচজন অন্য সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত। একটি নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যপাল এঁদের নিয়োগ করেন। এই নির্বাচন কমিশনে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী।

Scanned with CamScanner

কমিশনের মূল দায়িত্ব প্রকল্প রূপায়নে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। আইনের কোন বিধান ভঙ্গ হলে তা কমিশন অনুসন্ধান করে থাকে।

প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ নিবারণের জন্য দ্বিস্তর ব্যবস্থা আছে—জেলা নোডাল্ অফিসার এবং ব্লক পর্যায়ে একজন অফিসার। উপভোক্তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান ও নগর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে যুক্ত করা হয়েছে।

ভারতে গণবন্টন ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পাঁচ লাখের উপর ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shop) আছে। এই দোকানগুলি 330 মিলিয়ন দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্য সরবরাহ করে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। আর তা উপভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। উপভোক্তাদের কাছে খাদ্যশস্য পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যম।

সরকারী বিপণন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা ও অপুষ্টির অভিযোগ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে। তাছাড়া, দরিদ্র শ্রেণীর লোক নির্ধারণ করা নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ নিয়েও অনেক সমস্যা আছে। সেজন্য গণবন্টন ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

উপসংহারে বলা যায় যে ভারতের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ লোককে প্রতি মাসে খুবই স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে ভারত যুক্ত হল বিশ্বের কয়েকটি দেশের সঙ্গে যারা তাদের জনসংখ্যার অধিকাংশের জন্য খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করেছে।

Scanned with CamScanner

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (National Health Mission)

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার আগের পাঁচ দশক ধরে নানানভাবে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া, আন্তরাজ্য এবং কোন এলাকার মধ্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য ছিল। এছাড়া, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কয়েকটি রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল জনস্বাস্থ্য ও preventive medicine-এর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানের (quality of life) ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সরকার 2005 সালে একটি সুসংহত স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেন। এটি হল 'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' (National Rural Health Mission)।

এই মিশন আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। এর উদ্দেশ্য সারা দেশে গ্রামবাসীদের জন্য কার্যকরী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামীন মানুষদের বিশেষত পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলিতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানই এর লক্ষ।

অপরদিকে, দেশের শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য 2013 সালে চালু হয় 'জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন' (National Urban Health Mission)। এই মিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নগরবাসীদের বিশেষ করে শহরে বসবাসকারী আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীকে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। কিছুদিনের মধ্যেই দু'টি মিশন—'জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন' এবং 'জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন'—একত্রিত করে 'জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন' (National Health Mission) নামে এক অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই মিশনের লক্ষই হল ন্যায্য, সুলভ ও গুণমান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

স্বাস্থ্যের বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত। সব রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতিও সমান নয়। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মাধ্যমেই এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে এবং সব রাজ্যই একটা করে মৌ (Memorandum of

Scanned with CamScanner

Understanding)-এ স্বাক্ষর করেছে। কেন্দ্র নীতি রচনা করে দেয় এবং তা কার্যকরী করার দায়িত্ব রাজ্যের। মোট খরচের দশ শতাংশ রাজ্যকে বহন করতে হয়।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক নানান কর্মসূচী রয়েছে। যেমন, শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী, পতঙ্গবাহিত রোগ ও কিছু অসংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত কর্মসূচী। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক নানান কর্মসূচী এক ছাতার তলায় এনে এক ব্যাপক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে। নীচু তলা পর্যন্ত এই কর্মসূচী পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাই এই মিশনে পঞ্চায়েতের ভূমির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মৌ-তে যেভাবে উল্লেখ আছে সেই মত রাজ্যগুলি অর্থ, কর্মী ও কর্মসূচী পঞ্চায়েতের নিকট হস্তান্তর করবে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরে লোকবলের অভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের কাছে পৌছাতে পারেনি। তাই প্রতিটি রাজ্যে আশা (ASHA) নামে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ এবং অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা এক অভিনব উদ্যোগ। এইসব স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়োগ করেন এবং এঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছেই দায়ী থাকেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কমিটি গ্রামের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনা করেন।

উপসংহার

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিও এক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। তবে কোন কোন রাজ্য আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে সক্ষম নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারকে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও প্রয়োজন।

শিক্ষার অধিকার (Right to Education)

ভারতের সংবিধানে (41, 45 এবং 46 ধারা) বালক-বালিকাদের 14 বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের কথা বলা থাকলেও আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার 74.4 শতাংশ (জনগণনা, 2011)। এই হার অবশ্য সব রাজ্যে সমান নয়।

2002 সালে সংবিধান সংশোধন করে 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একটি নতুন ধারা (21A) সংবিধানে সংযোগ করা হয়েছে। ঐ ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র যেভাবে আইন প্রণয়ন করে নির্ধারণ করবে সেইভাবে রাষ্ট্র ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়স্ক সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে ("The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the state may, by

Scanned with CamScanner

law, determine.")। এছাড়া, 45 ধারাতে (86তম সংশোধন, 2002) বলা হয়েছে যে ছয় বছরের নীচে শিশুদের যত্ন ও শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করার জন্য 2009 সালে শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) সংসদে পাশ করানো হয়। এই আইন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার (Pre-school) ব্যবস্থা 2010 সালের এপ্রিল মাসে কার্যকরী হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার অধিকার প্রদান করা। তাছাড়া, এই আইনে (2010 সাল) শিশুদের বিনা বেতনে শিক্ষা পাওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন বাস্তবায়িত করা সরকার, পৌরসভা-পঞ্চায়েত, বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের দায়িত্ব (Responsibilities of Governments, Local authorities, School and Teachers)।এই আইনের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য খুজে পাওয়া যায় 'সর্বশিক্ষা অভিযান' কর্মসূচীর মধ্যে।এটা একটি অন্যতম জনকল্যাণকর প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা হয়েছে একযোগে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায়। সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচীর লক্ষ্য কর্মসূচী ও strategy-র সঙ্গে সমন্বয় করে "শিক্ষার অধিকার" আইন প্রণীত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রত্যেক শিশুর অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আছে। "অবৈতনিক শিক্ষা" (free education) বলতে বোঝায় কোন শিশু ও তার পিতামাতাকে শিশুর পড়াশুনার জন্য কোন ব্যায় বহন করতে হবে না। একইভাবে, বাধ্যতামুলক শিক্ষার (compulsory education) অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব প্রত্যেক শিশুখাতে বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে ঐ শিশুখাতে প্রবেশাধিকার পায় তার ব্যবস্থা এবং এলাকায় উপযুক্ত পরিকাঠামোসহ স্কুলের ব্যবস্থা করা। সরকারকে এটাও দেখতে হবে যাতে কোন শিশুর প্রতি কোন কারণে বৈষম্য প্রদর্শন করা না হয়।

শিক্ষার অধিকার আইনে স্থানীয় সরকার যেমন পৌরসভা ও প্রঞ্চায়েত-এর উপরও কিছু দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হল এলাকায় বিদ্যালয়ের (neighbourhood school) ব্যবস্থা করা, এলাকায় বসবাসকারী চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের নাম রেকর্ড করা, এদের স্কুলে ভর্তি ও হাজিরা সুনিশ্চিত করা যাতে করে প্রত্যেক শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করা যায়। একইসঙ্গে প্রত্যেক বাবা-মায়ের দায়িত্ব তার শিশুকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো।

শিক্ষার অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই আইনে বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের উপর কিছু দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক স্কুলকে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যার

Scanned with CamScanner

শতকরা কুড়ি ভাগ দুর্বল শ্রেণী এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ভর্তি করতে হবে এবং বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। আর কোন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে কোন অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না এবং ভর্তির সময় কোন বাছা-বাছি করা যাবে না। আবার কোন ছাত্রকে কোন ক্লাসে আটকে রাখা যাবে বা স্কুল থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। আরও বলা হয়েছে যে সরকার বা পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের অনুমতি ছাড়া কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করতে হবে।

প্রারম্ভিক শিক্ষা (Pre-School Education)

শিক্ষাকে সার্বজনীন করার একটা বড় সমস্যা হল প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ না থাকা বা কম থাকা। সেকারণে শিক্ষার অধিকার আইনে তিন বছরের উপর বয়স এমন শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে যাতে করে এইসব শিশুরা ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

পাঠ্যসূচী (Curriculum)

প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমতা আনার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে হবে। ঐ সংস্থা যখন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবেন তখন সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধ (values), শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

অর্থ (Finance)

শিক্ষার অধিকার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করার দায়িত্ব যৌথভাবে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে আর্থিক অনুদান রাজ্যকে সরবরাহ করবে। এটাও আশা করা যায় যে অর্থ কমিশন (Finance Commission) বিচার বিবেচনা করবেন কিভাবে রাজ্যগুলি অতিরিক্ত আয়ের উৎস প্রদান করা যায়।

উপসংহার

শিশু শ্রমিক বিলোপ করা হয়েছে এবং স্কুলে 'মিড ডে মিল'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প, খাদ্যের অধিকার এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন কর্মসূচী। আশা করা যায়, সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে অদূর ভবিষ্যতে।

Scanned with CamScanner